## ধ্রুপদ

ধ্রুপদ গানকে অনেকে বলেন আদি গান, এ কথা ঠিক নয়। কারণ, ধ্রুপদের আগে 'প্রবন্ধ' শ্রেণীর গান ছিল। সেই গান থেকেই ধ্রুপদ গানের সৃষ্টি হয়েচে এবং পণ্ডিতদের মতে 'প্রবন্ধ' গানের নিয়মগুলি ধ্রুপদে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রাচীন 'প্রবন্ধ' গানেরই নতুন সংস্করণ ধ্রুপদ

ধ্রুপদ গানের সৃষ্টিকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন মতে বলা হয় ১৩শ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে ধ্রুপদের সৃষ্টি হয়েছে, কোন মতে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর ( ১৪৮৬-১৫১৮ খৃ. ) এই গানের স্রষ্টা।

আধুনিককালের প্রখ্যাত সঙ্গীতকোবিদ ডা. বিমল রায় বলেন : ষোড়শ খৃষ্টাব্দ থেকে পেছিয়ে গিয়ে ধারা নায়ক বৈজু, নায়ক গোপাল প্রভৃতির সঙ্গে ধ্রুপদ-ধমারের সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াসী, তাঁরা সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেখাতে পারেননি আজও।...হিন্দুর সম্পত্তি হলেও জাহাঙ্গীরের আমল থেকে ধ্রুপদ-ধমার গিয়ে পড়ে মুসলিম গুণীদের হাতে এবং এই সময়ের বেশির ভাগ মুসলমান গুণীরাই যে হিন্দুবংশজাত, প্রমাণ দেওয়াও খুব কষ্টকর নয়।

ভাবের মাধুর্য, ভাষার শুদ্ধতা, গীতরীতির গাম্ভীর্য ও ছন্দের বৈচিত্র্য প্রভৃতি নানা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ধ্রুপদ গান আজও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। রাজা মানসিংহ তোমারের আগে এর সৃষ্টি হোক আর নাই হোক, ধ্রুপদ গানের প্রচারে তাঁর অপরিমিত অবদান চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই সময়েই বাদশাহ আকবরও ধ্রুপদ গানের প্রভূত পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁর দরবারের বিশিষ্ট গুণীরা সকলেই ছিলেন ধ্রুপদী। বিখ্যাত তানসেন এঁরই সভাসদ্ ছিলেন। তানসেন, বৈজু, গোপাললাল প্রভৃতি সকলেই ধ্রুপদ গান গাইতেন। পরবর্তীকালের বীণকারেরাও সকলেই ধ্রুপদ গানে পটু ছিলেন। ধ্রুপদ গানের অবয়ব খেয়ালের চাইতে বড়। এতে সাধারণতঃ চারটি ভাগ থাকে—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। অবশ্য শুধু স্থায়ী ও অন্তরার ধ্রুপদও শোনা যায়। এই ভাগগুলিকে 'তুক'-ও বলা হয়।

ধ্রুপদ যেমন গম্ভীর প্রকৃতির গান, তেমনি এর সঙ্গে চৌতাল, সুরফাঁক, তেওরা, রুদ্র প্রভৃতি গম্ভীর প্রকৃতির তালগুলি বাজানো হয় পাখোয়াজে। পাখোয়াজও গম্ভীর তালযন্ত্র। তাই ধ্রুপদের সঙ্গে পাখোয়াজের সঙ্গত হয়। আজকাল অবশ্য তবলাতেও সঙ্গত করা হচ্ছে কিন্তু তাতে ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা যথাযথ রক্ষিত হয় না। দুগুণ, তিগুণ, আড় ইত্যাদি কিছু লয়কারীতে ধ্রুপদ গাওয়া হয়। তবে এই ধরনের লয়কারীও সব ধ্রুপদে করা হ'ত না। ধ্রুপদ গাইবার আগে নোম্-তোম দ্বারা আলাপ করা হয়। মীড়, কণ্, গমক প্রভৃতির বাহুল্য এতে থাকে কিন্তু তান এখানে একেবারেই অচল।

ধ্রুপদ গায়কদের বলা হ'ত কলাবন্ত। কলাবন্তরা চারটি বিভিন্ন বাণীতে ধ্রুপদ গাইতেন। এই চারটি বাণীর নাম গওরহার ( বা গোবরহার ) বাণী

খন্ডার বাণী, ডাগুর বানী ও নওহর বানী। এ বিষয়ে উঁচু ক্লাসে গিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

খ্যালরীতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুপদের প্রচলন ক্রমেই কমে আসতে লাগল। আজকাল অবশ্য ধ্রুপদকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সে প্রচেষ্টার মধ্যে নিষ্ঠার অভাব দেখা যায়। কাজেই ধ্রুপদ তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা সন্দেহ।

## হোরী বা ধমার

চৌতাল, সুরফাঁকতাল প্রভৃতি যেমন তালের বিভিন্ন নাম, ধমার (বা ধামার) হ'ল তেমনি একটি চৌদ্দ মাত্রার বিষম ছন্দের তাল। কলাবন্তেরা, মানে ধ্রুপদ গায়কেরা, বসন্ত ঋতুতে—বিশেষ ক'রে হোলী উৎসবের সময় এই তালে হোলী (বা হোরী) গান গাইতেন। তাই হোরী গানকে অনেকে ধমার নামেও চিহ্নিত করতেন। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে এই গানকে লোকে ধমারই বলতে লাগলেন। এখন ধ্রুপদ, টপ্পা খ্যালের মত ধমার তালের গানগুলিকে ধমার নামেই চিহ্নিত করা হয়।

ধ্রুপদের জন্মবৃত্তান্ত যেমন ধোঁয়াটে তেমনি ধমার গানের সৃষ্টিকাল নিয়েও মতানৈক্য আছে। "যদিও ধ্রুব হইতে ধ্রুপদ ভাবিয়া নিই, ধমার বলিয়া কোনও কিছু আমরা সংগ্রহ করিতে পারি না। কোনও পণ্ডিত ধমার-কে ধর্মহার-এর অপভ্রংশ, কেহ বা ধর্ম+আর হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন। আধুনিক জ্ঞানীরা এ বিষয়ে কোনও নিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই এবং ধর্মহার বা ধর্ম+আর কি করিয়া এবং কবে সম্ভব হইয়াছিল তাহা মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছেন।" (সুরছন্দা' ৩য় বর্ষ—৯ম সংখ্যায় [জানুয়ারী, ১৯৫৭] ডা. ভূপেন সেন লিখিত, 'ধ্রুপদ ও ধমার')। তবে ধ্রুপদের সৃষ্টির সঙ্গে যেমন রাজা মানের নাম যুক্ত করা হয়, তেমনি অনেকের ধারণা ধমার শৈলীর গান স্বামী হরিদাসের কল্পনাপ্রসূত; এ বিষয়ে যথাযোগ্য প্রমানের অভাব আছে।"

ধমার গানের শব্দ-রচনা ধ্রুপদ অপেক্ষা লঘু প্রকৃতির। প্রধানত রাধা-কৃষ্ণের দোল-লীলার বিষয়বস্তু নিয়েই ধমার রচিত হয়। কাজেই এতে গাম্ভীর্য থাকে না। আজকাল যেমন খ্যাল গানের পর একটু লঘুরস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে ঠুমরী গাওয়া হয় তেমনি আগের দিনের কলাবন্তেরা ধ্রুপদের পর ধমার গাইতেন।

ধমার গাওয়া কিন্তু খুব সহজসাধ্য নয়। এতে যে তান দুগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়, কুয়াড়, বিয়াড় ইত্যাদি লয়কারীতে বাঁট করা হয়, তা বেশ অভ্যাস সাপেক্ষ। এতেও তান করা হয় না কিন্তু উপরোক্ত লয়কারীতে নানা ছন্দের বোলতান তৈরী করে গাওয়া হয়।

বিদ্যার্থীরা কিন্তু একথা মনে রাখবেন যে, হোরী সম্বন্ধীয় গান মাত্রই ধমার নয়। কারণ আধুনিককালে বাঈজিরা দাদরা, ঠুমরী ইত্যাদির পরে যে হোরী গান পরিবেশন করেন তার সঙ্গে ধমার-এর কোন সম্পর্ক নেই। যদিও বর্তমান কালের হোরী চৌদ্দ মাত্রায়ও (বা অন্য তালেও) গাওয়া হয়, কিন্তু সেই চৌদ্দ মাত্রার তালের নাম দীপচন্দী। তার ছন্দ-বিভাগ ধমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই হোরী গানকেই ধমার বলা হয়, যা ধমার তালে গাওয়া হয়।

## খেয়াল বা খ্যাল

খেয়াল শব্দটির অর্থ হ'ল "কল্পনা"। এটি পারসিক শব্দ। "সম্ভ্রান্ত" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দুটি অর্থই এক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। প্রথমতঃ এই গান সুবিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ আমীর খুস্‌রোর 'কল্পনা' প্রসূত, মানে তাঁর মন গড়া গান। তাছাড়া শিল্পী তাঁর নিজস্ব "কল্পনা" অনুযায়ী নানা রকমের তান, বাঁট ইত্যাদি মন-গড়া বিষয়-বস্তু দ্বারা অলংকৃত করে এই গান গাইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ খুস্‌রো সাহেব কওয়ালী রীতির গানকেই 'সম্ভ্রান্ত' রূপ দিয়ে খ্যাল গানে রূপান্তরিত করেন এবং 'সম্ভ্রান্ত' সমাজে তা প্রচারের চেষ্টা করেন।

বর্তমানে আমরা দুটি পদ্ধতির খ্যালের সঙ্গে পরিচিত।—একটি হ'ল বিলম্বিত লয়ের—যাকে বড় খ্যালও বলা হয়, আরেকটি মধ্য বা দ্রুত লয়ের—যাকে বলা হয় ছোট খ্যাল। নামে বড় হলে কি হয়, ছোট খ্যাল কিন্তু বিলম্বিতের চাইতে বয়সে বড়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যে-সময় মামুদ সুলতান এসে পাঞ্জাবে বসবাস আরম্ভ করেন, সেই সময় তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন একদল ইরানিয়নী গায়ক। তাঁদের বলা হ'ত কওয়াল। তাঁরা যে-গান গাইতেন, তা ছিল দ্রুত চালের অলংকারযুক্ত আরবীয় রীতির কওয়াল গান। আমীর খুস্‌রো এই গীত-রীতির কিছুটা উন্নতি করেন এবং প্রবন্ধ অঙ্গের নক্‌শ-এ-গুল, কলবানার সৃষ্টি করেন। এগুলি ছিল আরবী ও ফারসী ভাষার সংমিশ্রণে রচিত ভারতীয় ঢঙের গান। তার

সদারঙ্গের খ্যাল গানের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তে দেখে ধ্রুপদ গায়কেরা ক্রমেই শঙ্কিত হ'লেন এবং খ্যালকে "জনানা সঙ্গীত" বলে তাচ্ছিল্য দেখাতে লাগলেন। তখনকার দিনে এই ব্যঙ্গোক্তি একেবারে অসার ছিল না। তার প্রমাণ, সদারঙ্গ অসংখ্য খ্যাল রচনা করলেও যা অনেককে সে গান তালিম দিলেও নিজে তা কখনো গানই নি, এমন কি, নিজের বংশের কাউকেও এ গান শেখান নি—নিম্নস্তরের বলে।

খ্যালের সঙ্গে সদারঙ্গের নাম এমনভাবে জড়িত যে অনেকের ধারণা সদারঙ্গই খ্যাল গানের স্রষ্টা।

ছোট খ্যাল হ'ল চপল গান, তাই এর রচনা খুব সংক্ষিপ্ত। এতে দুটি ভাগ থাকে—স্থায়ী ও অন্তরা। স্থায়ী সাধারণতঃ দু' লাইনে। কখনো কখনো এক লাইনেও রচিত হয়। অন্তরাও তাই। ধ্রুপদের রচনা যেমন ধীর, শান্ত ও শৃঙ্গার রস প্রধান হয়, খ্যাল তেমনি বেশির ভাগই শৃঙ্গার রসাত্মক হয়ে থাকে। গাম্ভীর্য কম বলে এর সঙ্গে তবলা সঙ্গত হয় এবং বন্দিশ সাধারণতঃ ত্রিতাল বা দ্রুত একতালেই বাঁধা হয়। ছোট খ্যালে বিস্তার করার সুযোগ কম। প্রথমে মধ্যলয় তারপরে দ্রুত লয়ে গেয়ে শেষ করা হয়। গানগুলিকে অলংকৃত করা হয় নানা রকমের ছোট-বড় তান, বোলতান, সরগম ইত্যাদি দ্বারা।

বিলম্বিত বা বড় খ্যালের সঙ্গে ছোট খ্যালের মূল তফাৎ হ'ল লয়ের। সেই জন্যই বড় খ্যাল, ছোট খ্যালের চাইতে একটু গম্ভীর চালের হয়। বিলম্বিত খ্যালে বিশেষ প্রণালীতে আলাপ করা হয়—যাকে বলা হয় বিস্তার বা বঢ়ৎ। এই বিস্তার বা বঢ়ৎ হয় গানের সঙ্গে—আকার বা গানের বাণী সহযোগে ধীর মন্থর গতিতে। এতেও দুটি ভাগ থাকে—স্থায়ী ও অন্তরা। বিস্তার এই দুই ভাগেই হয়। বিস্তার হয়ে যাওয়ার পর চারগুণ ও আটগুণ ইত্যাদি লয়েই বেশির ভাগ তান করা হয়। এতেও বিভিন্ন প্রকারের তান ও বোলতান করার নিয়ম আছে। ধ্রুপদে যেমন মীড় ও গমক বেশী থাকে, বিলম্বিত খ্যালে তেমনি কণ্ ( স্পর্শ ) স্বরের প্রয়োগ বেশি হয়। এতেও মীড় বা গমকযুক্ত তান ও সরগম করা হয়। এর সঙ্গেও তবলা সঙ্গত হয় এবং বিলম্বিত লয়ের তাল—যথা তিলওয়াড়া, বিলম্বিত লয়ের একতাল, ঝুমরা, আড়াচৌতাল ইত্যাদি বাজানো হয়।

* * *

বর্তমানে এক রকম বিলম্বিত খ্যাল শোনা যায় যার প্রচলন হয়েছে

বোধ করি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর থেকে। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত—এই তিনটি লয়েরই একটি বিশেষ নিয়ম আছে। এর ব্যবধানেরও একটা সীমা আছে। মনে করুন, আপনি খুব ধীরে ধীরে চলচেন। এই ধীরে ধীরে চলার মধ্যে একটা ছন্দ আছে। একটি পদক্ষেপ থেকে আরেকটি পদক্ষেপের মধ্যে যে ব্যবধান, তারও একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। আপনি নিশ্চয়ই প্রথম পদক্ষেপের পর তিন বা চার হাত দূরে আরেকটি পা ফেলেন না। কারণ সেটা অস্বাভাবিক। তেমনি দ্রুত চলারও একটা সীমা আছে। ধরুন, আপনাকে বলা হ'ল একটু তাড়াতাড়ি চলুন। তখন, যে স্বাভাবিক ( মধ্য ) গতিতে আপনি চলছিলেন, গতিটা তা থেকে আরো এটু বাড়িয়ে দেবেন কিন্তু দৌড়বেন না। তা হ'লে এই দ্রুত চলারও একটা সীমা আছে, যা লঙ্ঘন করলে তাকে আর চলার পর্যায়ে ফেলা হয় না, দৌড়নোর পর্যায়ে ফেলা হবে। গান-বাজনার তিনটি লয় সম্বন্ধেও ঐ সংজ্ঞাই প্রযোজ্য। বিভিন্ন মাত্রা-সমষ্টি দিয়ে বহু রকমের তাল পূর্বাচার্যেরা রচনা করে গেচেন ; একই মাত্রা সমষ্টির দু'রকম তালও আছে। সেক্ষেত্রে এই দুই তালের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করচে তার প্রকাশভঙ্গীর ওপর। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, এই বৈশিষ্ট্যগুলি আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হচ্ছে। ১২ মাত্রার বিলম্বিত একতাল গাওয়া হচ্চে ৪৮ মাত্রায়, ১৬ মাত্রার তিনতাল ত্রিতাল বাজান হচ্চে ৩২, ৪৮ যত খুশী মাত্রায়। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীদের কৃপাদৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করচি। তাঁরা যদি একান্তই ১২, ১৪ বা ১৬ মাত্রার আবদ্ধ না থাকতে চান, তাহলে কবিগুরু যেমন নিজের গানের জন্য কয়েকটি বিশেষ তাল রচনা করে গেচেন, তাঁরাও তেমনি ৪৮, ৬৪ বা যে-কোন মাত্রার তাল তৈরী করে গান। তখন আর এই ধরণের কোন অবাঞ্ছিত আলোচনার সুযোগ থাকবে না।

## টপ্‌পা

লোক-রুচির সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্গীত শৈলীরও নানা উদ্ভাবন লক্ষ্য করার মত। ধ্রুপদের আগে যেমন প্রবন্ধাদি গীতের প্রচলন ছিল তারপর ধীরে ধীরে তার রূপান্তর হ'ল, জন্ম নিল ধ্রুপদ ও ধমার শৈলীর গান, তারপর এলো খ্যাল, তেমনি অনেকের ধারণা, প্রাচীন বেসরা গীতি থেকেই হয়েচে টপ্‌পার জন্ম। কোন কোন পণ্ডিতদের কাছে একথাও শোনা যায় যে মধ্য এশিয়া থেকে আগত-একদল কওয়াল ( মানে গায়ক ) পাঞ্জাব এবং তার পাশাপাশি

ভারতবর্ষে নবাবের দরবার সময় আসেন ও আমাদের দেশের সঙ্গীত-ঐতিহ্যের নিয়মে যে বিভিন্ন শৈলীর গান গাইতেন সেই গানই হল টপ্পা। তবে এ কথা স্বীকার্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন লক্ষ্ণৌ, উত্তর প্রভৃতি সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বিশেষ ছিল, টপ্পা ছিল সভা সমাজের গাইয়ে।

টপ্পা শব্দটি উর্দু বা পাঞ্জাবী নয়, হিন্দি শব্দ। কিন্তু টপ্পা গান পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত। যেহেতু এই গানের কথা খুব বিশুদ্ধ নয় এবং অমার্জিত ধ্বনি রয়েছে ছিল, সেই হেতু এই শ্রেণীর গানের কদর সমাজে ছিল অপাংক্তেয়। পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ-এর প্রসিদ্ধ গায়ক গুলাম নবী শোরী পাঞ্জাবের টপ্পা নামক গানকে সুসংস্কৃত করে জনসমাজে প্রচার করেন। এই জন্য শোরী মিঞা টপ্পার জন্মদাতা না হলেও টপ্পার সঙ্গে তাঁর নাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

টপ্পার রচনা চটুল প্রকৃতির। শৃঙ্গার রসই এর প্রধান উপজীব্য। কথা এতে কমই থাকে। বিশেষ ধরনের দীর্ঘ দানাদার তান ইত্যাদি দিয়ে এই শব্দগুলির বিন্যাস করা হয়। এতে শুধু দুটি অংশ থাকে— স্থায়ী ও অন্তরা। লঘু প্রকৃতির হওয়ার জন্যই সব রাগে বা তালে এ গান গাওয়া হয় না। এর জন্য কাফী, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, পীলু, বারোয়া, ভৈরবী প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির রাগগুলিই প্রশস্ত। টপ্পার ঠেকাও একটু ভিন্ন ধরনের হয়। বেশির ভাগ টপ্পাই পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত। টপ্পা গাওয়া খুব সহজ নয়, এর জন্য বিশেষ তালিমে গলা তৈরী করাতে হয়। এর জন্য নির্দিষ্ট ১৬ মাত্রার একটি তালকে টপ্পা তালও বলা হয়।

* * * *

বছর কয়েক আগে (অনুমানিক ১৯৬৬/৬৭)—তারিখ ঠিক মনে নেই—ডা. বিমল রায়, এম. বি. অমৃতবাজার পত্রিকায় টপ্পা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে একজায়গায় তিনি বলেছেন যে অনেকেই মনে করেন, শোরী মিঞার টপ্পাকে অনুসরণ বা অনুকরণ করেই বাংলার বিখ্যাত টপ্পা গায়ক স্রষ্টা ৺রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)-এই গান বাংলায় প্রচলিত করেন। কিন্তু ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন বাংলায় নিধুবাবুর টপ্পা কিছু কিছু লেখা হয়েছে, লক্ষ্ণৌ-এর কণ্ঠবান গুলাম নবীর নাম তখন লক্ষ্ণৌ-এর বাইরে কতখানি প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাহলে আগে, যখন সাধক রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১ খৃ.) ও নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৯ খৃ.) টপ্পা গাইতেন, সে সময় শোরী মিঞাও সংসারে উঠছেন। তাহলে?

তবে তাঁহার বাল্য এ কথাও বলেছেন যে সোরী মিঞার জন্ম সন জানা থাকলে এ সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত হওয়া যেত। তিনি গবেষকদের উপরোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।...

টপ্পার প্রচলন আজকাল কমে গেছে। এ-বিষয়ে আরো জানবার জন্য 'সুরছন্দা' সঙ্গীত-পত্রিকার বিশেষ টপ্পা সংখ্যা (সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬) পড়তে পারেন।

## ঠুম্‌রী

খ্যাল ও টপ্পার মত ঠুমরী এই সময়ে অনাদৃত ছিল গুণী সমাজে। কুলীন গায়কেরা সে সময়ে কোন আসরে ঠুমরী গাইতেন না। এই গানের প্রচলন ছিল শুধু বাঈজীদের মধ্যে। শ্রোতৃজনের জন্য নানা রাগের সংমিশ্রণ ক'রে বাঈজীরা নানা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা এ গান পরিবেশন করতেন। এতে শৃঙ্গার রসই প্রধান। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও পরিবর্তন ঘটে,—ঠুমরীও একদা সঙ্গীত দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায়। আজকাল যদি বিশিষ্ট খ্যাল গায়কেরা বিলম্বিত ও দ্রুত খ্যালের পর একখানি ঠুমরী না পরিবেশন করেন, তাহলে যেন সব আসরটাই নিষ্প্রভ মনে হয়।

ঠুমরী বা ঠুংরী হল ভাবপ্রধান। তাই এতে রাগের বিশুদ্ধতার চাইতে ভাবের বিশুদ্ধতার প্রতিই বেশি লক্ষ রাখা হয়। সতেরশ শতকের ফকীরুল্লা এবং মীর্জা খাঁ নামেদের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এক সময় ঠুমরী ছিল একটি রাগের নাম। পরবর্তীকালে গীতশৈলীর অর্ন্তগত হয়ে পড়ে। কদরপিয়া, ললনপিয়া, অখ্‌তরপিয়া প্রভৃতি অনেকে ঠুমরী রচনা করেন। লক্ষ্ণৌ-র বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রেমী নবাব ওয়াজিদ্‌আলী শাহ্ ঠুমরীর বিলক্ষণ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। 'অখতরপিয়া' উপনামে বহু ঠুমরী তিনি রচনা করেছেন, যার মধ্যে একটি বিখ্যাত গান—"বাবুল মোরা নইহর ছুটো যায়"।

ঠুমরীতে কথা খুব কম এবং এতেও স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি ভাগ থাকে। শৃঙ্গার রসযুক্ত ক্ষুদ্র প্রকৃতির গান হলেও ঠুমরীতে কোনরূপ চপলতা নেই। ভৈরবী, পীলু, কাফী, খমাজ (খাম্বাজ), তিলং, তিলককামোদ প্রভৃতি রাগে শান্তভাবে শব্দগুলির বিন্যাস সহকারে ঠুমরী গাওয়া হয়। টপ্পা যেমন যে কোন রাগে বা তালে গাওয়া যায় না, ঠুমরীও তেমনি। প্রধানতঃ যৎ, দীপচন্দী (বা চাঁচর), ধুমালী, পাঞ্জাবী, ত্রিতাল

প্রস্ফুটিত হতে থাকে। ছোট ছোট তান, মুড়কী, খিটকিরি ইত্যাদি দিয়ে তাকে সুন্দর করে তোলা হয়। তাছাড়া আমাদের কীর্তন গানে যেমন নানা রকম আখর যোগ করে ভাব অভিব্যক্ত হয়, তেমনি ঠুমরীতে বোল বানিয়ে নানা রকম বিন্যাস ক'রে ভাব প্রদর্শিত হয়।

ঠুমরীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, দীপচন্দী বা যৎ—যে তালেই হোক, গান আরম্ভ ক'রে বেশ কিছুক্ষণ গাইবার পর, মাঝখানে এবং শেষের দিকে হঠাৎ তাকে দ্রুত ত্রিতাল এবং কার্ফা তালে নিয়ে যাওয়া হয়। যাকে বলা হয় লগ্গী। এইভাবে দ্রুত লয়ে কিছুক্ষণ গেয়ে আবার মূল তালে ফিরে আসা হয়।

কুশলী শিল্পীরা অতি নিপুণতার সঙ্গে এতে নানা রাগের মিশ্রণ ঘটান, আবির্ভাব-তিরোভাব করেন এবং ভাবের অনুকূলে সরগম-এর প্রয়োগও করেন।

ঠুমরীর আরেকটি প্রকার দাদরা। দাদরা-ঠুমরীতেও নানা বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য এই শৈলীর ঠুমরীকে শুধু 'দাদরা বলে, চিহ্নিত করা হয়।

দুটি অঙ্গে ঠুমরী গাওয়া হয়—পূর্বী ও পাঞ্জাবী অঙ্গে। দুটির মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। কাজেই রুচি ভেদে কোনোটিকেই খারাপ বলা চলে না। বেনারস ও লক্ষ্ণৌতে যে ঠুমরী গাওয়া হয় তাকেই বলা হয় পূর্বী অঙ্গের ঠুমরী। পূর্ব বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধানতঃ এই ঠুমরী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। পাঞ্জাবী ঠুমরীতে টপ্পার প্রভাব লক্ষ্য করার মত। কথার চাইতে তানের কাজ তাতে বেশী থাকে। আজকাল অনেকে পূর্বী ঠুমরীর মধ্যে পাঞ্জাবী অঙ্গের মিশ্রণ করেন।

ক্ষুদ্র গীতের পর্যায়ে ফেললে কি হবে ঠুমরী গাওয়া বেশ কঠিন এবং এর জন্যও বিশেষ তালিম প্রয়োজন। গলার তৈয়ারী, রাগ-জ্ঞান তালে দক্ষতা থাকলে তবেই ভালো ঠুমরী গাওয়া যায়।

প. ভাতখণ্ডে ঠুমরী সম্বন্ধে বলেছেন ঃ ঠুমরী গান কখনই ঘৃণিত নয়। তবে হ্যাঁ, উত্তম রীতিতে যাতে ঠুমরী গাওয়া হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

'সুরছন্দা'র বিশেষ 'ঠুমরী' সংখ্যায় ( অক্টোবর '৮৫ ) এ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাবে।

## তরানা

াহিত্যে যেমন অর্থহীন কবিতা, সঙ্গীতে